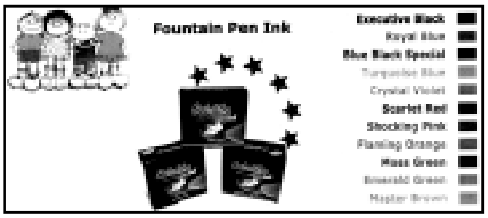

Vol. 01 No. 01 October 2010

Sulekha®

Sulekha News

সুলেখা সংবাদ

সম্পাদকের কলমে

সুলেখা আবার নতুন ভাবে কাজ শুরুর পর এখন বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে চলেছে। আগের মতো বিভিন্ন সংস্থা সুলেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুলেখাকে যেমন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঠিক তেমনই আমরা নিজেরাও এগিয়ে চলেছি দীর্ঘ ১৮ বছর বন্ধ থাকার পর। শুরুর মুখে নতুন কারখানায় কাজের জন্য এগিয়ে এলেন সুলেখার কর্মক্ষম পুরনো কর্মীরা। হাতে হাত মিলিয়ে পুরোদমে কাজে লেগে পড়লেন সকলে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে যুগেরও পরিবর্তন হয়েছে। কলমের কালির বদলে ডট্ পেন ও জেল পেনের চাহিদা বেড়েছে। অফিসে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রকমারি ষ্টেশনারী দ্রব্যের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের গৃহস্থলীতে কালো ফিনাইলের চল আর নেই বললেই চলে।

বাজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে নতুন সুলেখা নিয়ে আসলো Use and throw pen, বাচ্চাদের পেনসিল ও রাবার, কম্পিউটার প্রিন্টারের কালি, স্ট্যাম্প প্যাড, বিভিন্ন ধরনের আঠা, অফিস পিন ও আরও অনেক দ্রব্য। গৃহস্থলীর জন্য তৈরি হলো Camphora এবং Pynora নামে ঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার Herbal সামগ্রী। এর সঙ্গে যুক্ত হলো ন্যাপথালীন, ব্লিচিং পাউডার, Liquid Hand Wash এবং Easy Klin নামে বাসন ধোয়ার সাবান, শুরু হলো কোম্পানীর এক নতুন ডিভিশন - Home Products.

মানুষের প্রয়োজনে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে তাদের কাছে ঠিকমত পৌঁছে দেওয়ায় যাঁরা যুক্ত, তাঁদের আনন্দের সীমা নেই। অনেকেই তাই সুলেখার হয়েই জয়েন্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৌশিক মৈত্রকে বার বার প্রশ্ন করেছেন আমরা কেমন ভাবে এগিয়ে চলেছি তা সবাইকে জানান। ওঁনার চিন্তায় তাই 'সুলেখা সংবাদ' দ্বিমাসিক প্রকাশ করার এই প্রচেষ্টা শুরু করা হল। ছোট আট পৃষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করছি।

আশা করি নানা খবরে প্রতিমাসেই আপনাদের আপ্লুত করতে পারবো। আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই নিজেদের নানা খবরে '**সুলেখা সংবাদ**' ভরিয়ে তুলতে সাহায্য করবেন। আবার সুলেখার সুন্দর সংসার গড়ে উঠবে সকলের প্রচেষ্টায়।

কল্যাণকুমার মৈত্র।
চেয়ারম্যান,
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

প্রথমে বলি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকার 'পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদে' লেখা কথায়— 'সুলেখা ওয়ার্কস'— একটি স্বদেশী শিল্পের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

অধ্যাপিকা অনিতা বাগচী

'সুলেখা কালি'র সঙ্গে বাঙালি মানসের এক নষ্টালজিক সম্পর্ক। বল পেন প্রচলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ঝরনা কলমের কালি হিসেবে সুলেখা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ১৯৮৮-৮৯ নাগাদ কারিগরির ব্যাপক পরিবর্তন, ক্রেতার রুচি ও চাহিদা পরিবর্তন, অতিরিক্ত কর্মচারী বহনে অসুবিধা, সর্বোপরি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে সুলেখার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় আঠারো বছর পর ২০০৫ সালের ১০জুন সুলেখার কারখানা আবার খোলে। এর কিছুদিনপর ২০০৬ এর ৫ নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কারখানার উৎপাদন শুরু হয়েছে।

১৯৩০ থেকে ১৯৮০ দশক পর্যন্ত বাঙালির দৈনন্দিন জীবনের নিত্যসাথী 'সুলেখা কালি'-র একটি প্রামাণ্য ইতিহাস সংরক্ষণ স্বদেশী শিল্পের ইতিহাসের অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

স্বদেশী শিল্পের ইতিহাস পড়াতে গেলে প্রথমেই স্মরণে আসে ১৯০৫ সালের 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের খেদ— ''আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকে যে গবর্ণমেন্টের চাকরীতে মাথা বিকাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি চিন্তা করিব না? কেবল চাকরীর পথ আরও প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিব?

... আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্ণমেন্টের আপিস রাক্ষসের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের দ্বারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের দ্বারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ডাক্তার,আমাদের শিক্ষক, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফূর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।'' রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্খা যে বেশ কিছু স্বদেশী শিল্পের মধ্য দিয়ে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল 'সুলেখা ওয়ার্কস' ছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্বদেশী যুগে দূরবর্তী মফস্বল শহরতলিতে স্বদেশী শিল্প স্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেইসব উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। প্রসঙ্গত জলপাইগুড়ি শহরের কথা উল্লেখ করা যায়। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের রাজশাহী শহর ছিল 'সুলেখা'র শৈশবের লালন ভূমি।

বস্তুত স্বদেশী শিল্পগুলোকে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে হয় এবং স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন মালিকদের কার্যসাধন করতে হত। বাড়তি সম্বল বলতে ছিল উদ্যম, আত্মবিস্তার আর অনেকক্ষেত্রে স্বদেশী অনুপ্রেরণা।

'সুলেখা ওয়ার্কস'- এর মূল দুই উদ্যোগী ছিলেন শঙ্করাচার্য মৈত্র ও ননীগোপাল মৈত্র। শঙ্করাচার্য ছিলেন কট্টর গান্ধীবাদী আর ননীগোপাল নবম শ্রেণীতে পড়াকালীনই 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন আর তিনি ছিলেন রাজশাহী স্টুডেন্টস অ্যসোসিয়েশনের সভাপতি। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসের কলকাতা কনভেনশনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্য ১৯৩০ সালে ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ও সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত-এর নেতৃত্বে মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার ধরা পড়লেন রাজশাহী বীরকুৎসা অঞ্চলে নো- ট্যাক্স আন্দোলন করে।

এরপর ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে দুই ভাইয়েরই জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে সতীশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণায় রাজশাহীর 'খাদি প্রতিষ্ঠানে' কাজ নেন শঙ্করাচার্য মৈত্র।এদিকে ননীগোপাল জেল থেকে মুক্তিলাভ করে অ্যাপ্ল্যায়েড ফিজিক্সে এম. এস. সি. পরীক্ষায় বসেন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে উত্তীর্ণ হন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এম.এস.সি. পরীক্ষায় ড্রয়িং বিলিতি কালি দিয়ে করার প্রথা থাকলেও তিনি দেশী পেনসিল দিয়ে এঁকেছিলেন।

মৈত্র পরিবারে স্বদেশী আদর্শের প্রভাব ছিল। শঙ্করাচার্যের মা সত্যবতী দেবী ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাজশাহী মহিলা সমিতির সভানেত্রী। স্বভাবতই বিদেশী শাসকের আজ্ঞাবহ চাকুরির প্রতি তাঁদের আগ্রহ তৈরী হয়নি। সত্যবতী দেবীর সব ছেলেরাই ছিলেন স্থানীয় চরকা সমিতির সদস্য। এছাড়া তাঁরা 'বন্দেমাতরম' নাম দিয়ে খাতা বিক্রি করতে ফেরি করেন। ননীগোপাল মৈত্র এই সময় কিছুদিন রাজশাহী কলেজের অধ্যাপনা করেছিলেন।

শঙ্করাচার্য মৈত্র

ননীগোপাল মৈত্র

এদিকে মহাত্মা গান্ধীর অসংখ্য লেখার কাজে প্রচুর ফাউন্টেন পেনের কালি দরকার হত। দেশী কালিগুলোর মান তখন এত অনুন্নত ছিল যে তিনি বাধ্য হতেন বিদেশী কালি দিয়ে লিখতে, মহাত্মাজীই সতীশ দাশগুপ্তকে অনুরোধ করেছিলেন উন্নতমানের একটি দেশী ফাউন্টেন পেনের কালি তৈরী করতে। সতীশ বাবু নিজেই ছিলেন একজন রসায়নবিদ। তিনি 'কৃষ্ণধারা' নামে একটি ফাউন্টেন পেনের কালি বের করেছিলেন। সতীশ দাশগুপ্ত এই কালির ফর্মুলাটি মৈত্র ভাইদের হাতে তুলে দেন। 'সুলেখা' নামটিও সতীশবাবুরই উদ্ভাবন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর যে শিক্ষিত তরুণদের নিজের দেশে কলকারখানা গড়ে কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে সেই অনুপ্রেরণা গান্ধীজী তাঁদের মনে সঞ্চারিত করেছিলেন। তবে এর বেশ কিছুকাল আগে থেকেই কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে পত্রপত্রিকা ও বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিল। ১৯০১ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে ইনডাস্ট্রিয়াল এগজিবিশন করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিদেশী দ্রব্যের বয়কট কথাটিও জড়িত। কাশিম বাজারের মহারাজা এই এগজিবিশনের উদ্বোধন করে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের বিপক্ষে যে বক্তব্য রেখেছিলেন 'মারাঠা' পত্রিকায় তার বিরোধিতা করা হয়।

গান্ধীবাদে শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন, স্বরাজ আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে চরকা আর খাদি কাপড়কে মূল্য দেওয়ার ঐতিহ্য এইসব কারণে কুটির শিল্প একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিল। বস্তুত সুলেখা কালির ইতিহাস হলো একটি ছোট্ট কুটির-জাত শিল্পের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ একটি মোটামুটি বড় শিল্পে পরিণত হওয়ার ইতিহাস।

১৯৩৪ সালে সতীশ দাশগুপ্তের তৈরি করা ফর্মুলা নিয়ে শঙ্করাচার্য ও ননীগোপাল মৈত্র তাঁদের পিসতুতো

দাদা আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে ছোট্ট কারখানা চালু করলেন। কিন্তু সেখানে কাজ চালানোর কিছু সমস্যা হচ্ছিল। ফলে তাঁরা সুলেখা'র মূল বড় কারখানা রাজশাহীতে খুললেন।

ছেলেদের শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় সলতে পাকানোর কাজটি কিন্তু করেছিলেন অম্বিকা চরণ মৈত্র মহাশয় - শঙ্করাচার্য ও ননীগোপালের পিতৃদেব। চাকুরি শেষে প্রাপ্ত নিয়ে হাত লাগিয়েছিলেন নিজে কালি তৈরীর কাজে। অবসরপ্রাপ্ত একজন প্রৌঢ়ের এই নিষ্ঠা একমাত্র স্বদেশ প্রেমের বিরাট ব্যাপ্তির মধ্যেই জন্ম নিতে পারে বলে মনে হয়। গোড়ায় ছিল সামান্য পুঁজি। বাড়িতে বসে বৃদ্ধ সদস্য থেকে মেয়ে বউরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন কালি; খরিদ্দারের আস্থা তৈরির প্রয়াসে বিলি করতে হয়েছে অসংখ্য ফ্রি- স্যামপেল। আর ননীগোপাল বাবু সারাদিন ধরে অধ্যাপনা শেষে ফিরে এসে বাড়িতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন গভীর গবেষণায় কিভাবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেডিমেন্ট মুক্ত কালি তৈরী করা যায়।

ননীগোপালবাবু বিভিন্ন বিদেশী কালি যেমন পার্কার, কুইঙ্ক, স্ক্রিপ, স্টিফেন্স ও জাপানী কালিগুলোর বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনেকটা তুলনীয় দেশীয় কারিগরদের বিদেশী মেসিন খুলে ফেলে নতুন করে বানানোর প্রচেষ্টার সঙ্গে। তিনি একধরনের দ্রাবক মিশিয়ে কুইঙ্ক কালির অনুকরণে সুলেখা কালি তৈরি করলেন। 'সুলেখা স্পেশাল' ছাড়াও 'সুলেখা একজিকিউটিভ' নামে কালি তৈরী করা হয়। নিয়ত গবেষণার মাধ্যমে কালিটির গুণমান উন্নত করার ক্ষেত্রে আর যাঁদের নাম উল্লেখ্য তাঁরা হলেন বাঙালি কেমিষ্ট প্রেম নীহার নন্দী ও নরেন ভাদুড়ী। ননীগোপাল বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র কল্যাণ কুমার মৈত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯৭০ সাল থেকে 'সুলেখা'র জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কোম্পানির কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেন। ষাট এর দশকে সুলেখা'র যে উত্থান তা মূলত কল্যাণবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত মৈত্র পরিবারের এই উদ্যোগ কিন্তু সহজ সাফল্য পায়নি। ননীগোপাল মৈত্র সরকারি কলেজের কাজ থেকে বরখাস্ত হলেন রাজনৈতিক কারণে। তিনি কলকাতায় ফিরে বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোডে সুলেখা কালির একটি শোরুম খুললেন। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলেন।

১৯৩৮ সালে শঙ্করাচার্য মৈত্র কলকাতায় বউ বাজারে মদন দত্ত লেনে কারখানা খুললেন। এই সময়ে 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র মাখন সেন, সুধীন দাশগুপ্ত, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ এই স্বদেশী উদ্যোগটিকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। সপ্তাহে একাধিকবার সুলভে সম্পাদকীয়ের ওপরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী জায়গায় সুলেখা কালির বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে প্রচারে সহায়তা করেন। এমন কি হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলে বিল-ডিসকাউন্টের ব্যবস্থাও সুধীন দাশগুপ্ত মশায় করেছিলেন।

এছাড়া মদন দত্ত লেনের বাড়িওয়ালার সহযোগিতাও উল্লেখ্য। কোম্পানির বর্তমান চেয়ারম্যান বলছিলেন - বাড়িটিতে বাড়িওয়ালা নিজেও বসবাস করতেন। এমতাবস্থায় বাড়িটিতে কালি তৈরির কারখানা খুলতে দিয়েছিলেন। স্বদেশী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ থেকেই তিনি এই সহায়তা করেছিলেন।

আবার বিপরীত অভিজ্ঞতাও হয়েছিলো। ননীগোপাল বাবু নিজে কালির দাম আদায় করতে গেলে এক দোকানী তাঁকে বললেন- 'আগে বিক্রি করি পরে টাকা দেব।' এরপর ননীগোপালবাবু নিজেই কালি বিক্রি করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু অধ্যাপনা করতেন তাই লিফলেট ছাপলেন- 'অধ্যাপক ননীগোপাল মৈত্রের সুলেখা কালি'। নিজের কাঁধে কালির ব্যাগ নিয়ে প্রচার করায় ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী হয়ে সুলেখা কালি ব্যবহার করতে থাকে। এরপর ওই দোকানী ননীগোপাল বাবুর কাছে ক্ষমা চান।

এরপর থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত সুলেখার পরিস্থিতি উজ্জ্বল। ১৯৩৯ সালে কসবা অঞ্চলে কারখানাটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৪৬ সালে যাদবপুরে আড়াই বিঘা জমি লীজ নিয়ে কারখানা নিয়ে আসা হয়। পরে জমিটি কিনে নেওয়া হয়।

১৯৪৬ সালেই 'সুলেখা ওয়ার্কস' হল সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড। লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত ব্যালেন্সশীট রাখা হত না।

১৯৩৩-৩৪ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রভাব কমতে থাকে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত শিল্পের বিকাশ ঘটে। এই সময় ভারতের শিল্প বাণিজ্যে এরকম অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়েছিল। এই উন্নতির জন্য সংরক্ষণ শুল্ক ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বস্তুত বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পায়নের উন্নতি অনেকটাই সরকারের শুল্কনীতির উপর নির্ভর করে। ১৯৪৮ সালে সুলেখার বিক্রি প্রায় একলক্ষ টাকা। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম ধাক্কাটা সুলেখার মত ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সুখকর ছিল না। স্বাধীন দেশে বিদেশী দ্রব্য বয়কট, অপ্রসাঙ্গিক এই যুক্তিতে ভোগ্যপণ্যের 'ওপেন জেনারেল লাইসেন্স' অনুমোদন করায় বিদেশী পণ্যে বাজার ছেয়ে গেল। আবার লাইসেন্স নীতির ফলে আমদানির অঙ্ক বৃদ্ধি হল। সুলেখার বৃদ্ধিও ক্রমশ পড়তে শুরু করল। ট্যারিফ কমিশনের বাঙালি সদস্য বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দিলেন, ১৯৫০ সাল থেকে অবাধ কালির লাইসেন্স দেওয়া বন্ধ হল। কিন্তু ১৯৫২ সালে কোনরকম সরকারি ঘোষিত নীতির তোয়াক্কা না করেই কুয়িঙ্ক, ওয়াটারম্যান প্রভৃতি বিদেশি কালিদের ভারতে কালি তৈরির অনুমতি দেওয়া হল। আসরে এসে হাজির হলো সোয়ান, পাইলট প্রভৃতি কালি তৈরির কারখানা। কিন্তু এই কঠোর প্রতিযোগিতার মধ্যেও 'সুলেখা' তার বাজার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল পরিশ্রমী ও সুদক্ষ একদল কর্মীর চেষ্টায়। ১৯৫৩-৫৪ সালেও সুলেখার বিক্রি ছিল অন্যান্য সমস্ত ফাউন্টেন পেনের কালির মোট বিক্রি থেকে বেশি। সুলেখা ওয়ার্কসের ১৯৬৭'র বিক্রির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি টাকা। ফাউন্টেন পেনের কালি ছাড়াও সুলেখার উৎপাদনের তালিকায় যুক্ত হলো নানা ধরনের কালি যেমন চেক-রাইটিং, ডুপ্লিকেটিং, রাবার স্ট্যাম্পের, স্টেন্সিলের ও ড্রয়িং-এর কালি। এছারাও ছিল গদ, আঠা, গালা, ফিনাইল। বাজার ছড়িয়ে পড়ল দূরপ্রাচ্যে, মধ্যপ্রাচ্যে, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াতে। এমনকি ব্রহ্মদেশ গ্লোবাল টেন্ডারে সুলেখা থেকে ১৩০ টন কালি কিনেছিল। টেন্ডারের প্রতিযোগিতায় ছিল বিলিতী, মার্কিন ও চীনা কালি।

সুলেখা এই যুগে কালি তৈরির কাজে কালারমিটার, টিন্টোমিটার প্রভৃতি অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। ফ্যাক্টারিতে ছিল বিভিন্ন শাখা। রবারের পাইপ দিয়ে কালি ভরা, ছিপি আঁটা, লেবেল মারা সব কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করা হত। 'সুলেখা'র দুটি গেট আপ বিভাগের একটিতে কাজ করতেন পুরুষরা দিনে আটঘন্টা। অপরটিতে কাজ করতেন মহিলারা। বাড়ির কাজের পর তাঁরা এখানে চারঘন্টা কাজ করে জনপ্রতি মাসে ৪০/৫০ টাকা আয় করতে পারতেন। এই মহিলারা যাদবপুর শ্রমকল্যাণ 'সমবায় সমিতির' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে সমবায় পদ্ধতিতে কাজ পেতেন।

আর ছিল সুলেখার একটি ট্রান্সপোর্ট বিভাগ। পরিচালকরা একটি নিজস্ব সমবায় সংস্থা তৈরি করেছিলেন যেখান থেকে কর্মীরা সস্তায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ও জরুরি দরকারে ঋণ পেতে পারতেন। সমবায়টির পরিচালক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। এছাড়া ছিল 'দপ্তর শিল্প প্রতিষ্ঠান লিমিটেড' সুলেখার একটি সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান। স্ট্যাম্প, প্যাড, পিসবোর্ডের বাক্স, শিশির ছিপি সরবরাহ করা ছিল এর কাজ। সাংস্কৃতিক সংস্থা ও গ্রন্থাগার ছিল সুলেখা কোম্পানির। সুন্দর হস্তাক্ষর, রচনা প্রতিযোগিতা, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায় রচিত ছোট গল্প প্রতিযোগিতা প্রভৃতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও শিশুদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সুলেখা'র ভূমিকা শিল্প প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৬৬-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত আই. এন. টি. ইউ. সি-র ইউনিয়ন ছিল সুলেখায়। এরপর থেকে ছিল সি. আই. টি. ইউ- এর ইউনিয়ন। ১৯৬৫ সাল থেকে কর্মচারীদের বোনাস দেবার সিদ্ধান্ত হয়। কর্মচারীদের মত নিয়ে বোনাসের টাকা কোম্পানির শেয়ারে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর থেকে তাঁরা শেয়ারের উপর ডিভিডেন্ড পেতেন। উৎপাদন ব্যাহত হয় এমন কোন ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ হয় নি।

তবে সুলেখা'র উজ্জ্বলতা ক্রমশ ম্লান হয়ে এসেছিল অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগের ফলে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত ১৫০ জন লোককে নিয়োগ করেছিলেন কতৃপক্ষ। মোট কর্মী সংখ্যা দাড়ায় ৫৫০- এ। কর্মীদের বেতন দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় কারখানা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাঙ্কে ঋণ চাইলে তারা কর্মচারীর সংখ্যা কমাতে বলে। শেষ পর্যন্ত কর্মচারীদের বেতন দেওয়ার সঙ্গতিও থাকে না। ১৯৮৯ সালে কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সংস্থার ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল চার- পাঁচ কোটি টাকা আর দেনার পরিমাণ ছিল ছয় কোটি টাকার উপরে।

২০০৫-এ সুলেখা'র পুনরায় খোলার সময় পর্যন্ত কর্মীদের বকেয়া বেতন ৭০ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছিল ২ কোটি টাকার বেশি। গাজিয়াবাদ ও সোদপুরে কোম্পানির জমি বিক্রি করে সে সব মিটিয়ে দিয়েছিল সুলেখা কর্তৃপক্ষ। পুরসভা ও অন্যান্য সংস্থার বকেয়াও তারা মিটিয়েছেন। বন্ধ হওয়ার সময় কর্মীদের মধ্যে যাঁদের চাকরির বয়স এখনও আছে ও যাঁরা সক্ষম তাদের মধ্যে ৪০ জন পুনর্বহাল হয়েছেন। পাশাপাশি নতুন ৩০ জন নিযুক্ত হয়েছেন। উৎপাদন তালিকাতেও থাকছে পরিবর্তনের ছোঁওয়া। ফাউন্টেন পেনের কালির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কম্পিউটার প্রিন্টারের কালি, বিভিন্ন ধরনের আঠা, ফিনাইল, রুমফ্রেশনার, তুলি-রং ইত্যাদি। শুরু হচ্ছে একটি স্বদেশী শিল্পের নতুন পরিক্রমা।

কারখানার কিছু কর্মীদের কথাটা জানালে সবাই একান্তভাবে অনুভব করবেন সবকিছু।

প্রথম সংখ্যায় সবার কথা বলা যায় না। অবশ্য নানা সময়ে নানা মানুষের কাজের দিক তুলে ধরতে পারবো আশা করি। সুলেখা যখন কসবায় ১৯৪২ সালে পুরোদমে কাজ শুরু করে তখন থেকে রামলাল দে সুলেখায় কাজে নামেন। তখনকার দিনে ও পরে যাদবপুরে বড় কারখানা গড়ে ওঠার সময় রামলাল দের অকুণ্ঠ পরিশ্রমের কথা ভোলা বোধ হয় কারও সম্ভব নয়। নতুন কারখানায় তাঁর ছেলে সঞ্জীব কুমার দে আর ভাইপো অরুণ কুমার দে পুরোপুরি পুরনো ঐতিহ্য বজায় রাখার কাজে নেমেছে গেট আপে। এদিকে প্রসেসিং ডিপার্টমেন্টে শৈলেশ চক্রবর্তী আর নারায়ণ ভট্টাচার্য পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন নতুন জিনিস তৈরিতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আর বাবলু চ্যাটার্জী কয়েক বছর আগে যোগ দিয়ে পুরোপুরি কাজ শিখে এগিয়ে চলেছেন নানা জিনিসের প্রসেসের কাজে। তিনজন অনেক সময় একাত্ম হয়ে কাজে নেমে পড়েন ঠিকই। কিন্তু কাজের লড়াই-এ একটু আধটু ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা বলা যাচ্ছে না।

অনেকের ছেলেই আজকে সুলেখায় কাজ করছে। মনে পড়ে বনমালী বলত, 'ছবিটা' লেখাপড়ার দিকে কিছুই এগোলোনা। কিন্তু আজকে বনমালীর ছেলে কার্ত্তিক বলবন্ত ছাড়া বাবলু বাবুর চার্জের কাজ হয়ই না। আর যার যে কাজ দরকার ছবিকে বললেই তা হবে। অবশ্য ছবি ওর মেয়েকে পরীক্ষার হলে পৌঁছে দেওয়ার সময় কেউ জানতে পারে যদি ওর মোটর সাইকেলটা খুঁজে না পায়। বাবার চিন্তা মেয়ের মধ্যে ও ফোটাবেই লেখাপড়া শিখিয়ে।

গেট আপের শ্যামল চন্দ্র পালের নাতনির পর নাতিন হওয়ার আনন্দটা সবাই রসগোল্লার মাধ্যমে জেনেছে। আবার কয়েকদিন পরে অরুণ কুমার গাঙ্গুলি ওর বড় ছেলের ছেলে হওয়াতে সিঙ্গাড়ার সঙ্গে রসগোল্লা খাইয়ে সবাইকে আগে গোডাউনে সন্তোষদার পাশে বসে হিসেব লিখতেন যে হাসিখুসি অধীরবাবু, তাঁর কথাটা মনে করিয়ে দিল। ছেলেদের কথা আরও বলা যাবে। নানা সুলেখা সংবাদে পরপর।

এ বছর শুরুতে মুকুল ব্যানার্জীর ছেলে শুভ্র পারচেজ-এর কাজে দায়িত্ব নিয়ে সুনীল সরকারকে প্রোডাকশনে তাড়াতাড়ি এগোতে সাহায্য করছে। অবশ্য ওকে পেয়েও সমীর দত্তর ছুটোছুটি কমেছে বলা যায় না। সুলেখায় নতুন লোকদের কাজেরও খামতি নেই। নারায়ণ নস্করের গাড়ি মাল দেওয়ার জন্য সবসময় তৈরি। প্রয়োজনে ও নিজেই ঠিকঠাক করে রাখে। আবার কুন্তল

দে কলেজ থেকে পাস করেই এ্যাকাউন্টসের কাজে পুরোপুরি শুধু নামেনি মাঝে মাঝে গোপাল মাইতি ওকে ব্যাঙ্কের কাজে দৌড় করাচ্ছে। কেননা এককালের আমাদের হাসিখুশি মুরুলিধর মাঝির ছেলে শিবু ব্যাঙ্কের কাজের সঙ্গে অন্য কাজ নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করতে হচ্ছে। এদিকে ডিরেক্টর গোপাল ব্যানার্জী শরীর ঠিক না থাকায় গোপাল মাইতিকে ঠিকমতো সাহায্য করতে পারছেন না। ত্রিলোকী তিওয়ারির কথা না বললে খুবই ভুল হবে। এই বয়সেও পুরনো কারখানার সব কিছু ঠিকঠাক দেখাশুনা করে চলেছে।

আরও কিছু না বলে থাকা যায় না। ফিনিশ্‌ড গোডাউনের সুরেশ চক্রবর্তীর ছেলে বিলু সন্ধ্যের পর কাজ শেষ করে গড়িয়া থেকে যাদবপুর পর্যন্ত দোকানে দোকানে অনেক রাত পর্যন্ত সুলেখার মাল বিক্রি করে বেড়ায় সাইকেলে চড়ে তাদের চাহিদা মেটাতে।

কারখানায় যাঁরা এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন আমাদের কালি ফিল্টারে যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ সেই বিশ্বনাথ হালদার আর ল্যাবরেটারির কল্যাণ দা নতুন কিছু হয় তা কেমন করে তাড়াতাড়ি করা যায় সেই উদ্যোগে সবসময় ব্যস্ত। ওদের কথা বেশি শোনা যায় না। কিন্তু কল্যাণদার দিকে ফুটনি কাটলে ঠিকমত উত্তর অবশ্যই পায় তার সেই আনন্দময় হাসির সঙ্গে। আবার হারুকে যা বলা যায় সেই কাজেই লেগে পরে। গুরুর কথা মেনে চলে ঠিকই। কিন্তু গুরু আবার একএ ক বার ডেকে এটা ওটা সেটা করতে বলে। বলুন তো কাজ পুরোপুরি করতেই ভালো লাগে ঠিকই। কিন্তু এটা, ওটা, সেটা করতে কি মন চায়!

আমাদের ব্রজেশ্বরটা গরমে শ্বাস-প্রশ্বাসে ভোগে বলে ঠিক আসতে পারছে না কিছুদিন হল। কিন্তু ও থাকলেই প্রোডাকশন বেশ টেনে তোলে। না এলে সবার মনটা চায় ও তাড়াতাড়ি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠুক।

পুরনো কেমিস্ট তমাল সেন সরকারি কাজের শেষে রিটায়ার করে আবার সুলেখার ল্যাবরেটারির দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা সবাই খুশি। কারখানার সব কাজ গুছিয়ে করার জন্য আমরা আরও একজন বয়স্ক মানুষকে পেয়েছি। আমাদের মধ্যে নতুন উদয় গুপ্ত অবশ্য চলাফেরায় মেলা মেশায় যেন খুবই পরিচিত। মনে হয় ওঁর প্রচেষ্টায় গুছিয়ে ও পুরোদমে সব কাজ আমরা করতে পারবো। সবাইকে বলা যায় সমস্যা হলে জানাবেন কেননা ওঁর দায়িত্ব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখার। সমীর দত্ত দিল্লী থেকে ফিরে নতুন জিনিস কি নিয়ে এসেছে দেখা যাক।

এদিকে গোডাউনে সজল মুখার্জী কম্প্যুটারে শুধু চালান বিল তৈরি করছে না। সবাইকে নিয়ে পেটির পর পেটি মাল বার করতেই ব্যস্ত। কেমন করে হল? এবার আমাদের তৈরি জিনিসের বিক্রির বিষয় ভালোভাবে জানা দরকার। কোম্পানিটা আবার ঠিকমত বড় হয়ে দাঁড়াতে পারবে এই কাজটা পুরোপুরি ঠিকঠাক হলে তবেই তো ! সুলেখার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ঠিকই। একটু বয়স্করা দেখা হলেই বলেন আমি তো সুলেখা দিয়েই লেখাপড়া শিখেছি। একটু বেশি বয়স্করা বলেন আমাদের ছোটবেলায় সুলেখার ট্যাবলেট একটা শিশিতে জলে গুলে কলম দিয়ে লিখতাম। অবশ্য দিন যত এগিয়েছে কালির গুণগত মানের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। শুধু তাই নয় দেশি বিদেশি নানা কালির তুলনায় সুলেখা খুব নাম করেছিল ঠিকই। অবশ্য সুলেখা সব কিছুরই মান উন্নয়ণের কাজে সবসময় ব্যাপৃত থাকতো। এবার খোলার পরে দেখা গেল বাজারে নানা জিনিসের চাহিদা চলছে। আবার নতুন জিনিস তৈরি করার কাজেও সবাই নিয়োজিত হয়েছেন। পুরনো কর্মীরা পড়াশুনার সাহায্যেও নতুন ধরনের জিনিস তৈরি করা ও গুণমানে বাজারে চালু দ্রব্যাদির থেকে গুণের উৎকর্ষতা বাড়ানোর কাজে বেশ কয়েক বছর ল্যাবেটরিতে পুরোপুরি নিবদ্ধ থেকেও নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর প্রচুর মানুষকে দিয়ে ব্যবহার করিয়ে ঠিকমত জেনে তবেই বাজারে ছাড়ার কাজে এগিয়ে যাচ্ছেন। বলতে বাধা নেই বিগত একবছরে চাহিদা এতই বেড়েছে যে প্রোডাকশন বিশালভাবে বাড়ানোর জন্য আগে তৈরি দুটো শেডে জায়গা হচ্ছে না। তাই একটা নতুন শেড বিরাট আয়োজন করতে হচ্ছে। আশা করা যায় বছর খানেকের মধ্যেই ওই জায়গায় বহুগুণ বেশি মালপত্তর তৈরি করে বাজারে ছাড়া যাবে। এখন তাড়াতাড়ি কাজ বাড়ানোর জন্য এই অঞ্চলের মহিলারাও প্যাকেজিং এর কাজে এগিয়ে এসেছেন। সেই জন্য আশা করা যায় প্রোডাকশানের ঘাটতি তো হবেই না, 'আর পুরনো আমলের মত মহিলা সমিতি নানা ভাগে নানা জায়গায় কাজের ব্যবস্থায় বড় হয়ে সুলেখার সামাজিক ধারা আবার অক্ষুন্ন রাখবে।'

(পরের সংখ্যায় আমরা আমাদের সেল্‌স এর সঙ্গে যুক্ত সহকর্মীদের কথা বলবো।)

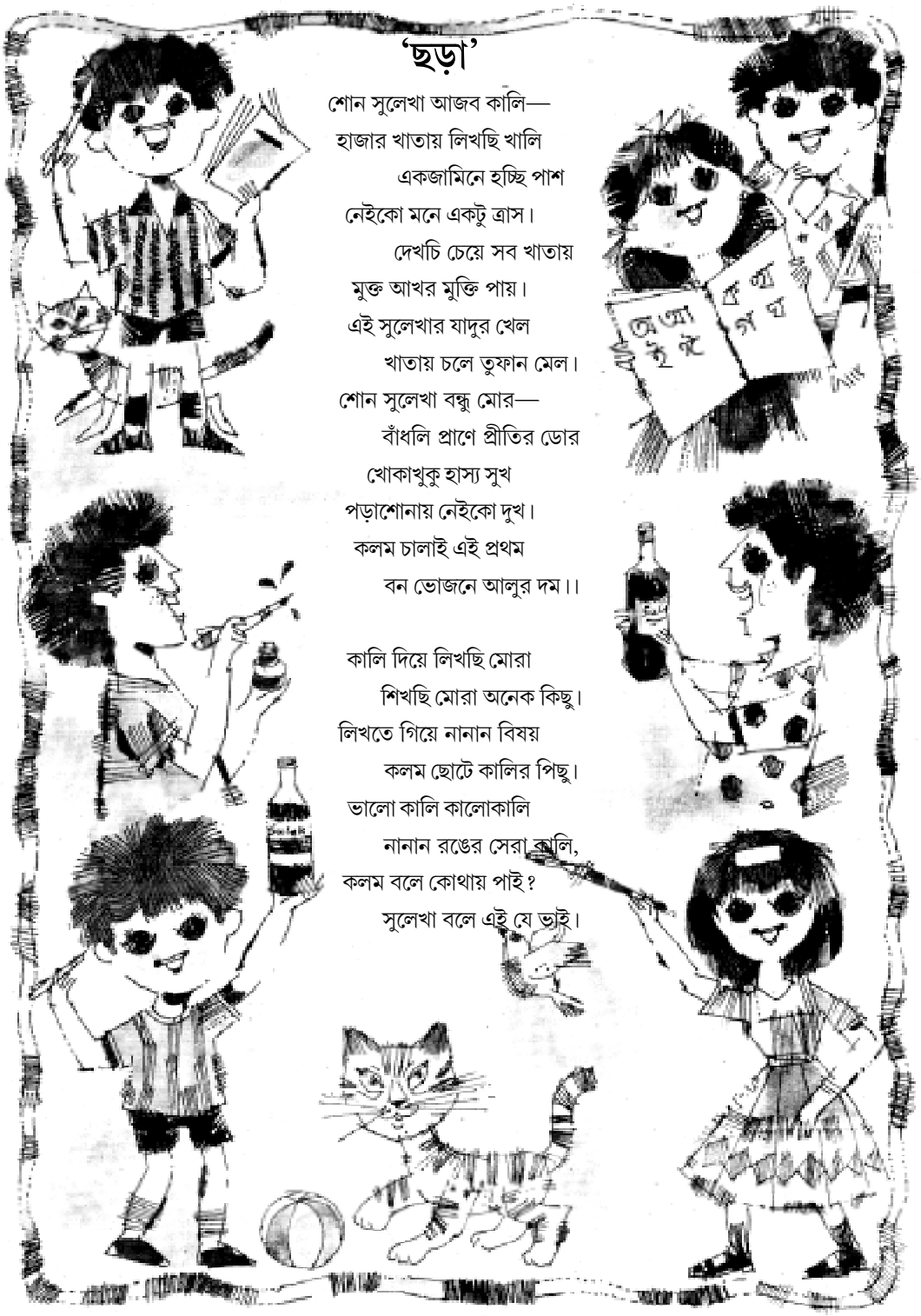

‘ছড়া’

শোন সুলেখা আজব কালি—
হাজার খাতায় লিখছি খালি
একজামিনে হচ্ছি পাশ
নেইকো মনে একটু ত্রাস।
দেখচি চেয়ে সব খাতায়
মুক্ত আখর মুক্তি পায়।
এই সুলেখার যাদুর খেল
খাতায় চলে তুফান মেল।
শোন সুলেখা বন্ধু মোর—
বাঁধলি প্রাণে প্রীতির ডোর
খোকাখুকু হাস্য সুখ
পড়াশোনায় নেইকো দুখ।
কলম চালাই এই প্রথম
বন ভোজনে আলুর দম।।

কালি দিয়ে লিখছি মোরা
শিখছি মোরা অনেক কিছু।
লিখতে গিয়ে নানান বিষয়
কলম ছোটে কালির পিছু।
ভালো কালি কালোকালি
নানান রঙের সেরা কালি,
কলম বলে কোথায় পাই?
সুলেখা বলে এই যে ভাই।